ছবি ঃ অমিত ধর

সুন্দরবনের খিদে আর অসুখ বিসুখের কড়চা

মুকুন্দ গায়েন

মানুষের তখনও প্রকট দরিদ্রতা। আলিশান দরিয়ার মত খেলছে দুস্তর ঢেউ। পারাবারহীন নৌকো কিছুতেই কূলের হদিশ পাচ্ছে না। আবার অসুখ বিসুখের ঠ্যালাও কত। যাকে বলে দৈব মার। খাবার দাবার বলতে ভুট্টা, মাইলো। আর দু কড়া জলের সঙ্গে কড়া খানেক পুঁইশাক সেদ্ধ। খাও তো পুঁই শাক। না খাও তো পুঁই শাক। এই খেতে খেতে কেউ মরছে ওলা উঠোয়। কেউ সান্নিপাতিক জ্বরে। কালা, ম্যালোরিয়ায়। ক্ষয় রোগ গ্যাসট্রিক ইত্যাদি। ডাক্তার কবিরাজ তখন কোথায়। ডাক্তার বলতে তখন মানিক মিস্ত্রী, শশী গায়েন, শশী মৃধা, মাদারচন্দ্র মৃধা। তাঁরা সব অসুখে বেলেডোনা দিয়ে থাকেন। নাক্সভোম্, পালসিট্লা দিয়ে থাকেন। কেন? এই তিনটে ওষুধ ছাড়া কি আর ওষুধ নেই? আছে। কিন্তু এই তিনটে ওষুধ তাদের স্বপ্নে পাওয়া। বাদল হাওয়ার মত। বেশ ভালো কথা। ভক্তিতে মুক্তি। পেটে ভাত জোটেনে, তো বড় ডাক্তার। পরণের কাপড় জোটেনে তো পথ্যি। পথ্যি বলতে সাগু আর বার্লি। তাও জোটাবার মত পয়সা নেই। মেয়েরা সর্বক্ষণের জন্যে একবস্ত্রা। এক কাপড়ে চান। এক কাপড়ে শরীর 'শুকনো'। কেউ মরছে নিউমনিয়ায়। কারু ধরছে রাজরোগ। কারো পেটে কাঁসোর (ক্যানসারের অপভ্রংশ কিনা কি জানে?)। পোয়াতি বউরা অপুষ্টিতে ভুগে ভুগে রক্তাল্পতায় ভুগে ভুগে একেবারে সাদা ফ্যাকাশে ফক্ ফকে সাদা পাতকাটির মত। শুধু পেটটাই যা দেখার। চোখ কোটারাগত। নিতম্ব নেই বললেও চলে। বুক সাদা-মাটা। পায়ের নখে কুনোখো। হাতের আঙুলে হাজা। তবু রস কত। একিবারে নাগরি গুড়ের কলসী। এ বউ ছেলে দেবে কী; বাচ্চা বিয়োবার আগে-ই না পিঠটান দেয়। খাবার-দাবার বলতে দিনান্তে একমুঠো পুঁইশাক সহ আটা ঘোঁটা। এই প্রসঙ্গে আমার বন্ধুর একটা গল্প জড়িয়ে আছে। গল্পটা এই রকম-আমরা তখন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। আমাদের বাক্য রচনা আসত। আমি বাক্য রচনায় পরম পন্ডিত ছিলাম, মানে মূর্খ।

আমাদের 'ঘন-ঘটা' বলে একটা বাক্যরচনা এসেছিল। আমার সতীর্থ স্বপন। স্বপন মন্ডল যে এখন কোনও একটি ব্যাঙ্কের শাখার শাখা প্রবন্ধক। জিগ্যেস্ করেছিল ঘনঘটার বাক্য রচনাটা একটু বলনা। বললাম, কেন বাড়িতে তো আটা-ঘোঁটা খাস। স্বপন কি বুঝল জানি না। ও লিখল-আমরা বাড়িতে আটা-ঘোঁটা খাই। কিন্তু ঘন নয়। পাতলা।

আটা-ঘোঁটা তাও বউ ঝিদের পাতে নেবার যেটুক টাইম। আর গুলো এসে চেটে-পুটে খেয়ে 'লেয়'। খেয়ে নিলেও তাদের ও পেট পড়ে থাকে লাউখোলের মত। কারো দিন কাটে এর ওর বাড়ির কলারমোচা থোড় খেয়ে। পাকা ডুমুর খেয়ে। কারু বা নোনাগড়গড়ি যদুপালন সেদ্ধ খেয়ে। আর যাদের তাও জুটছে না, তাদের বাপ-মা এর ওর বাড়ি চুরি চামারি করে এক আধ কাঁদি কলা চুরি করে, কুমড়ো চুরি করে এনে খাওয়াচ্ছে। যা হোক করে বেঁচে থাকতে তো, হবে। আবার অনেক পুরুষরাই চলে যাচ্ছে শীত বর্ষায় খাটতে। কোথায়? না, উত্তরে। উত্তর বলতে বর্ধমান, বনগাঁ, হুগলী, আরামবাগ, তালদি, ঘুটিয়াশরিফ, গড়িয়া। আবার কেউ কেউ বন বাদাড় করতে যাচ্ছে বাঘের মুখে। পশুর গাছের একটা টুম (Log) কেটে আনতে পারলে বারো আনা। ধুঁধুল গাছ পাঁচসিকে। পাঁচ সিকে কেন? না কাঠটা ভারি পালিশ হয়। শাল-সেগুনের কান কেটে দেবে-এমন ফার্নিচার কাঠ। (কাঁকড়ার টুম টাকায় দুটো।) ঘরের আড়ায় লাগিয়ে রাখো যুগ যুগ কেটে যাবে। উঁইয়ের বাপও মুখ বসাতে পারবে না। এক পোন্ ত্বরার কোড়ার দাম ন সিকে চোদ্দ আনা। এ কথাগুলো সত্যি কি মিথ্যে পুঁছে দেখ গে তোমার খুড়ীর কাছে। আমি সত্যি বই মিথ্যে বলব না। যদি বিশ্বেস্ না হয় তো জিগ্যেস করোগে তোমার মিত্যুকে। না, এ বড় কাব্যি ছন্দের কথা হয়ে যাচ্ছে। আমি বলব মানুষের নির্জলা দারিদ্র্যের কথা। দুঃখ কষ্টের কথা। নষ্ট হয়ে যাবার কথা।

মানুষ কখন ধর্মের দিকে এগোয়

অসহায় মানুষ একটা অবলম্বন খোঁজে। কখন? না, যখন পেটে ভাত থাকে না। পরণের কাপড় থাকে না। তেষ্টায় ঘরে জল থাকে না। চোখের উপর ছেলে মেয়েগুলো মরে যায়। অসহায় বাবা মা তখন একটা অবলম্বন খোঁজে। কী সে অবলম্বন? ধর্ম। যা নাকি ধৃ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে-পন্ডিতরা বলেন। মানুষ তখন কপালকে দোষ দিতে থাকে। বলেএ আমার 'ললাট্ লিখন'। আর সেই ফাঁকে ধার্মিক সম্প্রদায় ছুটে আসে,কেউ ক্রুশ কাঁধে করে। কেউ রুদ্রাক্ষের মালা পরে। কেউ গেরুয়া বসন পরে। কেউ মুন্ডিত মস্তকে কপালে ত্রিবলী চিহ্ন এঁকে। তারা এসে কয় ধর্মে থাকো জিরাফে থেকো না। সবতাতে থাকলে হবে নে। থাকতি হবে ধর্মে। ধর্মে থাকলে তোমারে সব দেব আমরা দুধ দেবো, ডিম দেবো, পাঁউরুটি দেবো, শুধু রোববারে রোববারে গিয়ে-গির্জায় প্রভুর প্রার্থনা করতে হবে। না খেয়ে মরার চেয়ে প্রভুর নাম করে মরা ভালো। তা কডায় যাতি হবে? সঙ্গত প্রশ্ন। যেতে হবে ভোর সাড়ে চারটের সময়। এতো পথ হেঁটে গোসাবায় যাওয়া তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। 'অত সকালে তো আমাগ্ মহেন্দ্র মাঝি লৌকো দেয় না।' দিতি বলবে। তাকেও প্রভুর কথা বলবে। এই সময় অনেককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত ও করা হয়েছিল। অভাবের দায়ে। দায় যে দস্তুর চেয়ে বড়ো গো।

আবার হিন্দু মৌলবাদীরা বলতে লাগল-'স্বধর্মে নিধনংশ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ' নিজের ধর্মে থাকো। মরো, মরো তবু ধর্ম ত্যাগ করো না। অনেকে ধর্ম ত্যাগ করল। অনেকে করল না। অনেকে দু একদিন লালন পালন করল বটে, পরে ফিরে আসল, তাই এখনও গোসাবায় অনেক অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরাই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। অন্ত্যজ বলতে আমি কোনও শ্রেণিকে আঙুল তুলে নির্দেশ করছি না। যাদের ঘরে একমুঠো অন্নের সংস্থান ছিল না-এইরকম আর কি। তবে, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ঘরে ভাত না থাকলে-সবাই অন্ত্যজ? না, তাও নয়। যারা আলসেমি, আর কুঁড়েমি করে নিজেদের জীবনটা কাটাতে চায় আমি সে রকম একটা শ্রেণিকেও এই কথাটা বলেছি। যদি দোষ ধরেন তো-আর বলব না।

তবু এখানকার মানুষ শিবভক্ত কালীভক্ত। শেতলা, ওলাইচন্ডী ভক্ত। ভক্ত ষষ্ঠী ঠাকরুনের বোনবিবির। বড়খাঁন গাজীর। আলী মদপের। সতীমার। হরি চাঁদেরও কিছু ভক্ত আছে। পেঁচো-পাচীর হরেক কিসিমের দেবতা রয়েছে এখানে। কার নাম যে বাদ গেল কি জানে? আমি একে তো রামানন্দ তায় পেয়েছে ধুনোর গন্ধ। হ্যাঁ আমি সেই মা মনসার কথা বলতে চাইছি। মনসার কথা না বললে তিনি আবার রেগে যাবেন। মা মাগো 'তুমি দেখো'। তোমার হিলেশ কিলেশ নিয়ে পোক্মাকড় নিয়ে তুমি তোমার মত থাকো আমরা তোমার শ্রাবণ মাসের শেষ অষ্টনাগ পুজোয় মনসা তলায় দুধ-কলা দেবো মা। তুমি রক্ষে করো। 'হাতে মাথায় ধুনো পোড়াবো মা শেতলা ঠাকরুন তুমি থানে বুঝে শুনো মা। তোমার নুন দেবো।' বাবা তারকেশ্বর তুমি আমার শূল ব্যথা তুলে ন্যাও। আমি নিমাই তিথির ঘাটে থে জল বয়ে তোমার মাথায় ঢেলে আসপো।'

'নিজে পায়না টেনা, তো পেত্ত্য হাটে গুড়ুক তামাক কেনা'। ছেলের অসুখে মা-মানসিক করে কালীর কাছে। মা গো, আমার ছেলের অসুখ সেরে দ্যাও তোমার দোরে কালো পাঁঠা বলি দে আসপো। অসুখ কাকতালীয়ভাবে সেরে গেলে-পুরুষ মানুষটার পোঁদ ফেটে যায় মানসিক নাওয়াতে গিয়ে। আর বউকে যত রাজ্যির আ-খাস্তা কু-খাস্তা কথা শোনায়। বউ বেচারী আর কী করবে? হয়ত সে একটা দীর্ঘ শ্বাস বুকে টেনে বলে-আর বলোনি। আমার মাথার ঠিক ছিলোনি। যাকগে যা হবার হয়ে গেছে। একবার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে। তাকে তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না। অতএব ...

গোসাবার গোপীনাথ ডাক্তার ও দৈব বলের ওষুধ

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের আবাদ এটা। এক লাখ বাহান্ন হাজার বিঘার আবাদী জমিদার তিনি। ভারি ভালো মানুষ ছিলেন।

লোকমুখে শুনেছি প্রজার কল্যাণে তিনি নিজেকে আত্মসমর্পন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রজাদের দুঃখ কষ্ট কোনদিন ঘোচেনি। তাঁর ম্যানেজার ছিলেন বাবু সুধাংশু মজুমদার। তিনি ভারি সজ্জন। ভারি চালাক চতুর। আমাদের সাহেব জমিদার কেন যে বাংলা ভাষাটা শেখেননি। ভাবলে ভারি আশ্চর্য হই। যদি বাংলা ভাষাটা শিখতেন তবে আজ আমাদের সোনার রাতদিন হ'তো। যাক গে ও সব দুঃখে আক্ষেপ করে আর লাভ নেই। আমার শোনা কথা ভুলও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। ... এখানকার মানুষরা যখন সাহেব এলে তাদের খিদের কথা জানাতে যেতো। হাত দিয়ে পেট দেখাত। বলতে চাইতো পেট একে বারে শূন্য। সাহেবের এসব ইঙ্গিত বোঝাবে কে। তখন ম্যানেজার বাবুর ডাক পড়ত। তিনি এসে বলতেন বুইলেন স্যার ওদের পেটের অসুখ। কেন পেটে অসুখ কেন? কারণ অন্য কিছু নয়। এই যে, আপনার নোনা আবাদে প্রচুর পরিমানে বড়ান ধান হচ্ছে; আর মাছও হচ্ছে খুবই। এই বাগদা, ট্যাংরা, গুলে, পারশে, ভাঙন, ভেটকি এই সব খাচ্ছে আর পেটের অসুখ বাধাচ্ছে।

ডাক্তারের ব্যবস্থা হলো- সদ্য এল.এম.এফ পাশ করা ডাক্তার। খুব সরু করে ছাঁটা চ্যাপলিনি গোঁফ। পরনে পাতলুন তার ভিতরে ইন করে ঢোকানো সার্ট। রুগী দেখার সময় ৮ থেকে ১১টা আবার ৪টে থেকে ৮ অব্দি। কথা বলেন খুবই ভারিক্কি চলে। হাঁটেন গটমট করে। দূর দূরান্তর রোগীদের জন্য একটা খাল পাড়ে লাইন ঘরও করে দেওয়া হলো। যেটা এখন পঞ্চায়েত কার্যালয় হয়েছে। যা হোক পরিষেবা পেতে গেলে তা কিছু পয়সার প্রয়োজন হয়। গোপীনাথ ডাক্তারের কাছে তখন গরিবদের কোনো 'চিক্কিসে' ছিল না। গেলে বলত - "টাকার ওষুধ খাবে, না ফ্রি ওষুধ খাবে। মানুষ সহজে ফ্রির দিকে চলে যেতে চায়। বলত 'ফ্রি-ফ্রি।' গোপীনাথ বলতেন তবে যাও ওখানে (মানে গোপীনাথ বাবুর বাড়ি থেকে পশ্চিম পাশে একটা কাঠের বাংলো ছিল দাতব্য চিকিৎসালয় হিসাবে।) সতীশ কম্পাউন্ডার বসে আছে ওর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাও। ওষুধ বলতে- লাল, নীল সাদা রঙের বোতোলের গায়ে চিহ্ন স্বরূপ কাগজের পটি মারা থাকত। সে ওষুধ খেতে কেউ ভালো হোতো কেউ ম'রে যেতো। কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না। মরার সময় গালে একফোঁটা ওষুধ পড়েছে; এই না, কত। যারা রুগীর গালে ওষুধ দিতে পারত না- তারা শোকের সময় বলত -বাবা আমার ম'লো কিন্তুক গালে একফোঁটা ওষুধ দিতি পারলাম নারে। হায় কপাল। কী মন্দ কপাল কে নে আয়চি। আবার এর ভিতরে কেউ কেউ জিগ্যেস করত-কি করে ম'লো? - কি কুরে ম'লো তো, আমি কবো কী কুরে। আমি তো তারে ডাক্তার বদ্যি দ্যাকাতি পারিনি। ভগমান জানে। কি করে ম'লো। লায়েক বেটা ঝার মরে তার কি আর মাথার ঠিক থাকে দিদি। এই হলো তাদের শোকতাপ জুড়োনোর পরি ভাষা।

যারা টাকার ওষুধ খেতো, তারাও যে, সব সময় বেঁচে যাবে তার কোনও মানে নেই। তবে, টাকার ওষুধ খেতে গেলে, হালের দামড়া বেচতে হবে, নয়তো জমি বন্ধক। তার চেয়ে দৈব বলের উপর ভরসা রাখাই ভালো। যদি কেউ দৈব বলে বেঁচে উঠত- তবে রুগীর বাড়ির লোকজন সাত গাঁ ভিক্ষে করে দেবতার ঋণ শোধ করত। দেবঋণ। পিতৃঋণ। মাতৃঋণ। রাখা মানেই গো হত্যার সামিল। এই ভাবে গজিয়ে ওঠে মানুষের ভেতর ধর্মের আঁকুর (অঙ্কুর)। সেই ধর্মের গায়ে কেউ হাত দিলে সে শুনবে কেন? এইভাবে কত যে লৌকিক দেব দেবী গড়ে উঠেছে আমাদের বাংলা মুলুকে তার ইয়ত্তা নেই। যে কথা আমি এই লেখার প্রথমেই শুরু করে ছিলাম। যেমন হিঁদুর শীতলা-মারী মড়কের দেবী। চৈত্র বৈশাখে যার ভারি প্রাদুর্ভাব। কিন্তু দেখতে শুনতে মা ঠাকরুন কোলকেতার কলেজে পড়া যানা যুবতী মেয়েদের মত। গুরু নিতম্বিনী। সুউন্নত কুচযুগ। কিন্তু মোল্লাগো যে ওলা বিবি তারে দেখতে নাকি ভারি কুচ্ছিত। কেমন কুচ্ছিত। না, হাড় জিরে জিরে শোনচুলো। ফিকিলা গাল। গা কুঞ্চিত। কপালে বার্ধক্যজনিত অসংখ্য নদী-নালার মত বলীরেখা। খুন খুনে বুড়ি। কোমোরে একটা পুঁটুলি। এ মাঠ সে মাঠ এ আগান সে বাগান ঘুরতে ঘুরতে কারো বাড়িতে শেষ রাতে গিয়ে যদি ওঠে- তবে সব্বোনাশ। "একবার ভেদ, একবার বমি- থকলো রে তোর জোমা-জমি।" এ কথা যদি বিশ্বেস্ না হয় তবে পড়ে দ্যাখোগো তোমার হাসান আজিজুল হকের আগুন পাখি।

আর এক চিকিৎসা সেই একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউ পারবে না। ভগবানের যদি দয়া হয়। তবে সে বাঁচল। নচেৎ ডাক্তারের বাপকে গুলে খাওয়ালেও রক্ষে নেই। রুগীর যদি জ্ঞান থাকে আর একবার রুগীর পাশে কোনও কোয়াক ডাক্তার (সবই কোয়াক তখন) যদি এসে বসে। তবে রুগী নিজেই ক্ষীণকণ্ঠে বলত; বাবা তুমি আমার গালে ওষুধ দিয়ো না। কেন?- না আমার, বাল-বাচ্চা বাঁচবে না। সব বিক্রি বাঁটা হয়ে যাবে। তার চে নিজির পরানে নিজি মরা ভালো-আমার পরিবারটা তো বাঁচল। হয়ত দু-দিন কষ্ট হবে তাদের। তারপর সব ভুলে যাবে। এটা জগতের নিয়ম। আমার গালে তুমি ওষুধ দেয়ো না। যদি বাঁচি দৈব বলে-ই বাঁচপো। রাখে হরি মারে কে? যার মারে হরি তরে ঠ্যাকায় কেডা।

(সুন্দরবনে এখন অনেক সুস্থ সবল জীবন যাপন ফিরে এসেছে, ঘোর বিশ্বায়নের মধ্যে আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে তারা আছে। যা হোক এই লেখাটির সময় ৬০-এর দশক থেকে কিছু শুনে কিছু নিজের অভিজ্ঞতায় ...।)

লেখক প্রান্ত সুন্দরবনের বাসিন্দা, কবি।